# ইসলামী বিজ্ঞানের পৌরাণিক কাহিনী

## খান মুহাম্মদ

### কুরআন বলে, পৃথিবী সমতল

প্রথম দিকে আমার বই পড়ার অভ্যাস খুব একটা ছিল না। ক্লাস এইটে হঠাৎ খুব ধার্মিক হয়ে গেলাম। আমার বই পড়াও তখন থেকে শুরু হল। বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের বই পড়া শুরু হয় তিন গোয়েন্দা বা সেবার অনুবাদ দিয়ে। আমাদের বাসায় ধর্মীয় বইয়ের জোয়ার ছিল বলেই বোধহয় আমার ক্ষেত্রে সেরকম হয়নি। যে কারণেই হোক, স্বীকার করছি, ইসলামের প্রতি আগ্রহ থেকেই আমার বইয়ের প্রতি আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল। একসময় সবচেয়ে বেশী মজা পেতাম তথাকথিত ইসলামী বিজ্ঞানের বইগুলো পড়ে। সেখানে কুরআন-হাদিসের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের আশ্চর্য সব সাদৃশ্যের ব্যাখ্যা দেয়া থাকতো। সাথে এটাও খেয়াল করতাম, অধিকাংশ ধার্মিকই বইগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ে না। কেবল জানে যে, এই নামে একটা বই আছে। এটাও মেনে নেয়, কুরআন সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। তারা মনে করে, ঐ বইগুলোতে কুরআনের বিজ্ঞানময়তার সঠিক ব্যাখ্যা দেয়া আছে; যদিও ব্যাখ্যাটা সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই।

কিন্তু আমার খটকা লাগতে শুরু করলো। বুঝতে পারলাম, অধিকাংশ ব্যাখ্যাই একেবারে মনগড়া। তিলকে তাল বানানো। তবে সেটা আমার বিশ্বাসকে টলাতে পারল না। অন্তত কয়েকটি আয়াতের ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু, এর কারণ এখন বুঝি। কারণ, তখন সংশয় কি জিনিস তা জানতামই না, আর বিজ্ঞান কি জিনিস তা বুঝতামই না। আসলে মহা বিস্ফোরণ আর মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের বিষয়গুলো আমি ধর্মীয় বইয়েই প্রথম পড়েছিলাম। সেখান থেকেই আগ্রহের সূচনা। পরবর্তীতে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের বই থেকে এগুলো পড়তে লাগলাম। তখনই খটকাটা দৃঢ় হতে শুরু করলো। প্রকৃত বিজ্ঞানীদের এতো সূক্ষ্ম ও কষ্টসাধ্য আবিষ্কারগুলোর কত হাস্যকর ব্যাখ্যাই না অলৌকিকতার বিজ্ঞানীরা (তথাকথিত "ইসলামী বিজ্ঞানী"রা) বের করেছে। তখন মনকে প্রবোধ দিলাম এই বলে, কুরআন তো আর বিজ্ঞান গ্রন্থ না, কুরআন হল জীবন কিভাবে চালাতে হবে তারই নির্দেশনামূলক গ্রন্থ।

ভার্সিটিতে আসার পর ইন্টারনেটের সাথে পরিচয় হল। এখন আর বই লাগে না। ইন্টারনেটে লেখার অভাব নেই। কুরআনের জীবনাদর্শের অসারতাও এবার পরিষ্কার হতে শুরু করল। এক্ষেত্রে আমার পারিবারিক জীবনেরও প্রভাব ছিল। আমাদের বাসার পরিবেশকে গোঁড়া ইসলামী পরিবেশ বলা যায়। আমার ছোট বোনকে ক্লাস এইট থেকে বোরকা পরার জন্য চাপাচাপি করতে লাগলেন আমার বাবা-মা। বোরকা পরাতে তাদের খুব কষ্ট করতে হয়নি। একসময় যখন নেকাব পরানোর জন্য আব্বু-আম্মু উঠেপড়ে লাগল তখন আর সহ্য করতে পারলাম না। আমি স্পষ্ট করে বললাম, আমি নেকাবের সম্পূর্ণ বিপক্ষে। কেউ স্বেচ্ছায় পরলে পড়ুক, কিন্তু কোন চাপাচাপি করা যাবে না। এভাবেই ইসলামী জীবনাদর্শ ধীরে ধীরে ত্যাগ করতে শুরু করলাম।

এখন আমি স্বাধীন। তাই স্বাধীন মনে লিখতে বসেছি। আবার সেই কুরআন হাতে নিয়েছি, তবে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। আগে অজু করে নিতাম, এখন অজু ছাড়াই কুরআন হাতে নিয়েছি। আগে অন্ধ একটা বিশ্বাস সবকিছুকে দমিয়ে রাখত। কুরআনকেই শাশ্বত সত্য মনে করতাম, বিজ্ঞানের সাথে না মিললে মনে করতাম, ভবিষ্যতে সব ঠিক

হয়ে যাবে। এখন আর তা মনে করি না। আসলেই দেখতে চাই, কুরআন আল্লাহ্ প্রদত্ত নাকি সপ্তম শতকের মানব রচিত কোন সাধারণ গ্রন্থ।

আমি এই ইসলামী বিজ্ঞানের সবকিছু নিয়ে স্বাধীনভাবে লিখতে চাই। অভিজিৎ রায় তার "Does the Qur'an Have any scientific Miracles?"[১] প্রবন্ধে যে দশটি বিষয় নিয়ে লিখেছেন সেখান থেকেই একটি বেছে নিলাম। আমার লেখার উদ্দেশ্য সবাইকে বোঝানো যে, কুরআনে কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়নি। কুরআনে অবৈজ্ঞানিক অনেক কিছুই আছে। সে সময়ে সাহিত্য হিসেবে তা যে মর্যাদাই পাক না কেন, আধুনিক বিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে কুরআনের কোন মূল্য নেই। কেউ অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে চাইলে করুক; কিন্তু কেউ যেন কখনও কুরআনের পক্ষে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে পার পেয়ে না যায়। আমরা চাই বিজ্ঞানমনস্ক উদার সমাজ গঠন করতে। লেখাগুলো সেই সমাজ নির্মাণের জন্যই।

এর জন্য প্রথমেই পৃথিবীর আকৃতি নিয়ে কুরআনে কি কি আয়াত আছে এবং সেগুলোতে কি বলা হয়েছে তা দেখে নেয়া প্রয়োজন। মুনিম সালিহ্'র "The Myth of Scientific Miracles in The Quran: A Logical Analysis"[২] প্রবন্ধে পৃথিবীর আকৃতি নিয়ে কুরআনের আয়াতগুলোর তালিকা পেয়েছি। অভিজিৎ রায়ের উপরে উল্লেখিত প্রবন্ধেও দুটি আয়াত পেয়েছি। দুটি আয়াত পেয়েছি জাকির নায়েকের বক্তৃতায়। সেগুলোই প্রথমে তুলে দিচ্ছি। মা'আরেফুল কুরআনের অনুবাদে আয়াতগুলো এরকম:

> [২: ২২] যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা (ফিরাশা) এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসেবে। অতএব, আল্লাহ্র সাথে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না। বস্তুতঃ এসব তোমরা জান।
>
> [১৩: ৩] তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত (মাদ্দা) করেছেন এবং তাতে পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে দু'দ প্রকার সৃষ্টি করে রেখেছেন। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করেন। এতে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা চিন্তা করে।
>
> [১৫: ১৯] আমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিস্তৃত (মাদাদনা) করেছি এবং তার উপর পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি।
>
> [১৮: ৪৭] যেদিন আমি পর্বতসমূহকে পরিচালনা করব এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন একটি উন্মুক্ত প্রান্তর এবং মানুষকে একত্রিত করব অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়ব না।
>
> [১৮: ৮৬] অবশেষে তিনি যখন সূর্যের অস্তাচলে পৌঁছলেন; তখন তিনি সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখলেন। আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন।

**[১৮: ৯০]** অবশেষে তিনি যখন সূর্যের উদয়াচলে পৌঁছলেন, তখন তিনি তাকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখলেন, যাদের জন্যে সূর্যতাপ থেকে আত্মরক্ষার কোন আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি।

**[২০: ৫৩]** তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে শয্যা (মাহ্‌দা) করেছেন এবং তাতে চলার পথ করেছেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি।

**[৩১: ২৯]** তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন? তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত ভ্রমণ করে। তুমি কি আরও দেখ না যে, তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন?

**[৩৯: ৫]** তিনি আসমান ও যমিন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে কাজে নিযুক্ত করেছেন প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত। জেনে রাখুন, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

**[৪৩: ১০]** যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে করেছেন বিছানা (মাহ্‌দা) এবং তাতে তোমাদের জন্যে করেছেন পথ, যাতে তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পার।

**[৫০: ৬-৭]** তারা কি তাদের উপরস্থিত আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে না আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং সুশোভিত করেছি? তাতে কোন ছিদ্রও (ফুরুজ) নেই। আমি ভূমিকে বিস্তৃত (মাদাদনাহা) করেছি, তাতে পর্বতমালার ভার স্থাপন করেছি এবং তাতে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদ্‌গত করেছি।

**[৫১: ৪৮]** আমরা ভূমিকে বিছিয়েছি (ফারাশনা)। এবং আমরা কতই না উত্তম সমতল রচনাকারী (আল-মাহিদুন)।

**[৭১: ১৯]** আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিছানা (বিসাতা)।

**[৭৮: ৬]** আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা (মিহাদা)।

**[৭৯: ২৭-৩০]** তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের, যা তিনি নির্মাণ করেছেন? তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন। তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং এর সূর্যালোক প্রকাশ করেছেন। পৃথিবীকে এর পর বিস্তৃত (দাহাহা) করেছেন। (ওয়াল আরদা বা'দা যালিকা দাহাহা)

**[৮৮: ২০]** এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কিভাবে সমতল বিছানো (সুতিহাত) হয়েছে?

**[৯১: ৫-৬]** শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন, তাঁর। শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত (তাহাহা) করেছেন, তাঁর।

সাধারণ কাউকে এই আয়াতগুলো পড়তে দিলে তার বুঝতে কোন অসুবিধাই হবে না যে, কুরআনে পৃথিবীকে সমতল বলা হয়েছে। সমতলভাবে বিস্তৃত পৃথিবীর কথা বোঝানোর জন্য যত রকমের শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে তার প্রায় সবই কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দগুলো হচ্ছে ফিরাশা, মাদ্দা, মাদাদনা, মাহ্‌দা, মাদাদনাহা, ফারাশনা, আল-মাহিদুন, বিসাতা, মিহাদা, দাহাহা, সুতিহাত এবং তাহাহা। শব্দ অবশ্য এতোগুলো না। একই শব্দ বিভিন্ন পদে ব্যবহৃত হয়েছে। আমি হুবহুই লিখলাম। আল-মাহিদুন দিয়ে তো একেবারে পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ আত্মপ্রশংসা করে বলছেন, আমরা কতই না উত্তম সমতল রচনাকারী। "শব্দার্থে আল-কুরআনুল মাজীদ" বইয়ে হুবহু এই অনুবাদই পেয়েছি।

কুরআনের সবচেয়ে বড় ত্রুটি ধরা পড়ে যুলকারনাইনের বিশ্ব ভ্রমণের বর্ণনাতে। এ ধরণের বিশ্ব ভ্রমণ আমরা পৌরাণিক কাহিনীতেও পাই। যুলকারনাইন সূর্যের অস্তাচলে পৌঁছেছেন, অর্থাৎ সূর্য যেখানে অস্ত যায় সেখানে গিয়েছেন। সেখানে বসবাসকারী জাতিও দেখেছেন। আবার সূর্য যেখানে উদিত হয়ে সেখানেও গিয়েছেন। সেখানেও এক সম্প্রদায় বাস করতো। সূর্য তাদের খুব কাছে, আল্লাহ সূর্য থেকে তাদের রক্ষার জন্য কোন আড়ালও তৈরী করেননি। এখানে পৃথিবীকেন্দ্রিক খুব সংকীর্ণ এক বিশ্বের ধরণা ফুটে উঠেছে। সেই পৃথিবীও আবার সমতল। এই তলের এক পাশ থেকে সূর্য উদিত হয় এবং অন্য পাশে অস্ত যায়। সে হিসেবে পৃথিবীর প্রান্তও আছে। কারণ যুলকারনাইন উদয় এবং অস্তাচলের পর আর এগোননি। সেখানেই যেন পৃথিবীর শেষ।

## কুরআনে এ ধরণের ব্যাখ্যা থাকাই স্বাভাবিক

কুরআনে এ ধরণের ব্যাখ্যা পেয়ে আমি মোটেই অবাক হয়নি। কারণ, কুরআন লেখা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ১৪০০ বছর আগে সেই সপ্তম শতকে। তখন আরবে পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে যে ধারণা প্রচলিত ছিল কুরআনে তো তা-ই থাকবে। যেকোন সময়ের রচনা তো সে সময়ের চিন্তাধারারই প্রতিফলন।

মধ্যযুগে, পৃথিবী সমতল এরকম একটি ধারণা ছড়িয়ে পড়েছিল। এর মূল কারণ গ্রিক দর্শন এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অবনতি এবং খ্রিস্টান ধর্মের জাগরণ। খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকেই পিথাগোরাস বলেছিলেন, সকল জ্যোতিষ্ক গোলাকার। সে হিসেবে পৃথিবীও গোলাকার। তবে এরিস্টটল বলেছেন, লুসিপাস ও ডিমোক্রিটাসের মত প্রাক-সক্রেটীয় দার্শনিকরা সমতল পৃথিবীতে বিশ্বাস করতেন। ৩৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দেই এরিস্টটল গোলাকার পৃথিবীর পক্ষে পর্যবেক্ষণমূলক প্রমাণ দেন। তখন থেকে গ্রিক সভ্যতায় গোলাকার পৃথিবীর ধারণাই প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাবে এই ধারণা টিকতে পারেনি। লক্ষ্যণীয় যে, এই খ্রিস্ট ধর্মই এরিস্টটলের পৃথিবীকেন্দ্রিক ভুল মতবাদ প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য বিজ্ঞানীদের পুড়িয়ে মেরেছিল।

এরপরের যুগটা ছিল অন্ধকারের। ইসলামী ইতিহাসেও ইসলামের আবির্ভাবের আগের সময়টাকে “আইয়াম-ই-জাহিলিয়াত” বলা হয়। তখন আরবের সবাই মনে করতো, পৃথিবী সমতল। মুহাম্মাদ ইসলাম প্রচার শুরু করার পূর্বে আরব সমাজ নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করেছেন এবং সফরগুলোর মাধ্যমে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। এই সাধারণ বিষয়গুলো তিনি ভালভাবেই জানতেন।

ইসলামকে কেন্দ্র করে আরব সংঘটিত হয়। এর মাধ্যমে সেখানে একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক বিপ্লব ঘটে। ইসলাম হয়ত তাদেরকে সংঘটিত করেছে, কিন্তু জ্ঞান বিকাশের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতি কুরআনকে কেন্দ্র করে হয়নি। হয়েছে প্রাচীন

গ্রিক দর্শন ও বিজ্ঞান অধ্যয়নের মাধ্যমে। মধ্যযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের কেউই তথাকথিত ইসলামী বিজ্ঞানী ছিলেন না। তারা ধর্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞান আলাদাভাবে অধ্যয়ন করেছেন। পৃথিবীর আকৃতি নিয়েই একটি উদাহরণ দেয়া যায়। গ্রিক দর্শন আরবিতে অনুবাদ করতে গিয়ে তারা জানতে পারেন যে, পৃথিবী গোলাকার। ৮৩০ সালে খালিফা আল-মামুন এক দল জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে বর্তমান সিরিয়ার দুটি শহরের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাপের কাজে নিযুক্ত করেন। তারা শহর দুটির দূরত্ব ও অক্ষাংশের পার্থক্য পরিমাপ করে পৃথিবীর পরিধি নিণয় করেন। পরিধির এই মান প্রায় নিখুঁত ছিল। কুরআনে পৃথিবীকে সমতল বলা হয়েছে না গোলাকার বলা হয়েছে এ নিয়ে সেই বিজ্ঞানীরা চিন্তাই করেননি। চিন্তা করলে নিশ্চয়ই কিছু বলে যেতেন।

কুরআনে পৃথিবীর আকৃতি নিয়ে প্রথম কথা বলেন ইবন তাইমিয়াহ্ যিনি বিজ্ঞানী ছিলেন না। তিনি "মাজমুল ফাতওয়া" গ্রন্থে বলেছিলেন, পৃথিবী গোলাকার এটা কুরআনে বলে দেয়া আছে। ইবন আব্বাসের হাদিসের সূত্র দিয়ে এই আয়াতের যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন, বর্তমানের ইসলামী বিজ্ঞানীরা সেটাকেই ফলাও করে প্রচার করেন। এই অসার ব্যাখ্যার কথা একটু পরে বলছি। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, কোন মুসলিম বিজ্ঞানী কুরআনের সাথে বিজ্ঞানকে মেশানোর চেষ্টা করেননি। কেবল ধর্মতত্ত্ববিদেরাই সে চেষ্টা করেছেন।[৩]

## ইসলামী বিজ্ঞানীদের ঘোলাটে ব্যাখ্যা আর আমাদের পরিষ্কার ব্যাখ্যা

ইসলামী বিজ্ঞানীরা আবিষ্কারে খুব একটা পারদর্শী না হলেও উদ্ভাবনের বেলায় অতুলনীয়। কুরআনের খুব সাধারণ কোন আয়াত থেকে তারা অনেক কিছু **উদ্ভাবন** করেন। তাদের ব্যাখ্যা মোটেই বৈজ্ঞানিক না। কিন্তু ধর্মতত্ত্বে এ ধরণের ব্যাখ্যার অবকাশ আছে। আমি যতদূর দেখেছি, ধর্মতত্ত্ব এমন একটা বিষয় যেখানে একই বিষয়র অনেক রকম ব্যাখ্যা দেয়া যায় এবং সবগুলোই খুব আধ্যাত্মিক (যৌক্তিক বলা যাবে না) মনে হয়। কুরআনের তাফসিরগুলো দেখলেই বোঝা যায়। ইসলামের মধ্যে এতো দল তৈরী হওয়ার অন্যতম কারণ একই বিষয়ের হরেক রকম ব্যাখ্যা। সবাই নিজের ব্যাখ্যাকে সঠিক মনে করে। কুরআনের আয়াতগুলো সুন্দর কিন্তু ভোঁতা। অনেক ফাঁক আছে। কিন্তু বিজ্ঞান এমন না। বিজ্ঞানের কিছু বিষয়েও মতভেদ আছে, কিন্তু মতভেদগুলো প্রমাণ করে, সে বিষয়ের সবকিছু এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পূর্ণতা পেলে তাতে কারও সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

ইসলামী বিজ্ঞানীরা কুরআনের মধ্যে বিজ্ঞান খোঁজেন। খুঁজে পেলে বলেন, কুরআন এক অলৌকিক গ্রন্থ। কুরআনে বিজ্ঞান আছে বলে তা অলৌকিক, অথচ বিজ্ঞানে আবার অলৌকিক বলে কিছু নেই। যাহোক এসব বিচারে তাদেরকে অলৌকিকের বিজ্ঞানীও বলতে ইচ্ছে হয়। কুরআনের তাফসিরকারীদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও তাদের ধর্মকথাগুলো বেশ ধারালো হয়। কিন্তু অলৌকিকের বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা অতিরিক্ত ভোঁতা যা পড়লে মাঝেমাঝে হাসি পায়। তাদের অপবিজ্ঞান চর্চা নিয়ে বিজ্ঞানীদের চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য চিন্তা করতে হচ্ছে। কুরআন ও বিজ্ঞানের সুসম্পর্ক দেখিয়ে গাদি গাদি বই বেরোচ্ছে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ বিজ্ঞান সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানে না। তারা এগুলো পড়ে বিভ্রান্ত হচ্ছে। এজন্যই তাদের ব্যাখ্যাগুলো খতিয়ে দেখার প্রয়োজন পড়ছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের "গবেষণা বিভাগ" থেকে "Scientific Indications in Holy Quran" নামে ৬৬৯ পৃষ্ঠার একটি বই বেরিয়েছে। এই বিভাগে এম আকবর আলী ও সাউথ-ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এম শমসের আলীর মত ব্যক্তি আছেন। তারা বিস্তৃতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে:

*এ সকল আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, পৃথিবীপৃষ্ঠ সমতল। অথচ ধারণাটি পৃথিবী গোলাকার-এ বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়। নিম্নোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এই আপাত বৈপরীত্যের মীমাংসা করা সম্ভব।*

*আমরা জানি একটি ক্ষেত্র যত বড় হবে তার তলের বক্রতা তত কম হবে। পৃথিবী একটি বিশাল ক্ষেত্র যার ব্যাস প্রায় ৬, ৪০০ কিলোমিটার। আর আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পৃথিবীপৃষ্ঠের খুব সামান্য একটা অংশ নিয়েই কাজ-কর্ম করে থাকি। এই অংশটুকুকে সকল ব্যবহারিক কাজে সমতল ধরে নেয়া যেতে পারে। এই স্বল্প অংশের বক্রতার পরিমাণ উপলব্ধি করার মত নয়। এমনকি, পৃথিবীপৃষ্ঠের এক মাইলের মত দূরত্বও পৃথিবীর কেন্দ্রে এক ডিগ্রির ৭০ ভাগের এক ভাগের মত অতি সামান্য কোণ সৃষ্টি করে। এই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, এই ক্ষেত্রের তলকে সমতল বলা হয় যার ব্যাসার্ধ্য সীমাহীন, অনন্ত।*

এটা আমার জীবনে পড়া সবচেয়ে ফালতু ব্যাখ্যাগুলোর একটি। কুরআনের আয়াতগুলো পড়লেই বোঝা যায়, সমতল পৃথিবীর কথা বলা হচ্ছে। এখানে আমরা এমন এক আল্লাহ্‌র সন্ধান পাই যার জ্ঞান এরিস্টটলের চেয়েও কম। যুলকারনাইনের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা পড়লে তা আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। সেজন্যই কি শমসের আলীরা ১৮ নং সূরার ৮৬ ও ৯০ নম্বর আয়াত দুটি এড়িয়ে গেলেন? পুরো বইয়ে এ আয়াত দুটির কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু ৯৩ ও ৯৪ নং আয়াত দুটি আছে। কারণ সেখানে ভুলের পরিমাণ কম। এক্ষেত্রে শমসের আলীরা রক্ষণাত্মক ভূমিকা নিয়েছেন, বিজ্ঞানকে আক্রমণ করেননি।

এবারে অন্য কথায় আসি। শমসের আলীরা বললেন, কুরআনে সত্যিই পৃথিবীকে সমতল বলা হয়েছে। কিন্তু জাকির নায়েক আবার অন্য কথা বলে বসলেন, তিনি উল্টো আক্রমণ করলেন। কারণ, attack is the best defense. অলৌকিকের বিজ্ঞানীরা যখন শমসের আলীদের (এটা অবশ্য তাদের মৌলিক না) ব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মানুষকে বোঝাতে পারছিলেন না তখন, অতি জটিল আরবি ভাষার পুরাণ ঘেঁটে "দাহাহা" শব্দের নতুন অর্থ বের করা হল। কুরআনে অন্য সব শব্দের মতই দাহাহা শব্দটি "বিস্তৃত" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তারা বললেন, দাহাহা শব্দের একটি মূল "দুহিয়া"। দুহিয়া অর্থ উট পাখির ডিম। তার মানে কুরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ পৃথিবীকে উট পাখির ডিমের মত বিস্তৃত করেছেন। এই সেদিন উদ্ভাবিত হল এটা। এ বিষয়ে জাকির নায়েকের ব্যাখ্যাটা এরকম:[৪]

*কুরআনের যত স্থানে "বিস্তৃতি" বা "বিছানা" বা এ ধরণের সমার্থক শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোকে জাকির নায়েক পরে বলেছেন। আগে বলেছেন [৩১: ২৯] ও [৩৯: ৫] আয়াত দুটির কথা। তার ভাষায়:*

*রাত্রি দিবসে অন্তর্ভুক্ত হয়, আর দিবস রাত্রিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানে অন্তর্ভুক্ত হওয়া অর্থ হল রাত্রি ধীরে ধীরে এবং ধারাবাহিকভাবে দিনে পরিবর্তিত হয় এবং ঠিক তার বিপরীতভাবে দিনও। পৃথিবী গোলাকার বলেই এ ধরণের ঘটনা সংঘটিত হতে পারে। পৃথিবী যদি সমত হতো, তাহলে রাত্রি থেকে দিনে এবং দিন থেকে রাত্রিতে হঠাৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেতো।*

জাকির নায়েক [৩৯: ৫] আয়াতের "ইউকাব্বিরু" শব্দের উল্লেখ করেছেন যার অর্থ আবৃত করা বা কুণ্ডলী করা বা গোলাকার কিছু জড়ানো। গোলাকার শব্দটি অবশ্য তার উদ্ভাবন।

এই ব্যাখ্যাও শমসের আলীদের সমতল পৃথিবী ব্যাখ্যার মত অসার। একটা প্রশ্নের মাধ্যমেই তা বোঝা যায়। ধরুন, আমি পৃথিবী সমতল না গোলাকার তার কিছু জানি না। এখন আমাকে কেউ প্রশ্ন করল, দিনের সব আলো নিভে গিয়ে কি হঠাৎ করেই রাত চলে আসে? আমি বলব, না তো। ধীরে ধীরে দিন রাতে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ দিনের আলো ধীরে ধীরে নিভে যায় এবং রাত ধীরে ধীরে নেমে আসে। এর মানে কি আমি বললাম, পৃথিবী গোলাকার? মোটেই না, আমি যা দেখি তাই বললাম। ঐ যুগের কোন কাফিরকে প্রশ্ন করলেও সে একই উত্তর দিত। কুরআনে অভিনব কিছু লেখা হয়নি।

তবে জাকির নায়েক এখানেই থেমে থাকেননি। এরপর তিনি বললেন [৭৯: ৩০] আয়াতটির কথা। তিনি দাবী করলেন, ইতোমধ্যে কুরআনে বলা হয়েছে যে, পৃথিবী গোলাকার। এরপর এই আয়াতে নাকি বলা হয়েছে, তা ডিমের মত দুই পাশে চাপা। এতোদিন পর্যন্ত সকল তাফসিরেই "দাহাহা" শব্দের অর্থ করা হয়েছে বিস্তৃত। কিন্তু এখন বলা হল, দাহাহার আরেক অর্থ নাকি উট পাখির ডিমের মত বিস্তৃত। এটা সত্যি হলেও কিছু প্রমাণ হয় না। কারণ দাহাহা ছাড়াও সমতল বা বিস্তৃতির অনেকগুলো প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা আমি উপরে উল্লেখ করেছি। তার যেকোন একটি সত্য হলেই হয়। কারণ, আল্লাহ্ একটি ভুলও করতে পারেন না। সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায়, কুরআনে সে সময়ের ধ্যান-ধারণা বলা হচ্ছে। তারপরও জাকির নায়েককে প্রশ্ন করা হল। তিনি চারটি পয়েন্টের মাধ্যমে বিস্তারিত উত্তর দিলেন:

১. পৃথিবীকে বিছানোর (কার্পেটের মত) কথা বলা হয়েছে। তার মানে পৃথিবীর কেন্দ্রভাগের চারদিকে ভূ-ত্বক বিছানো হয়েছে। কার্পেট তো গোলাকার জিনিসের উপরও বিছানো যেতে পারে।

> কথা হচ্ছে, কুরআনে ভূ-ত্বকের কোন কথাই নেই। সব স্থানে বলা হয়েছে গোটা পৃথিবীটাই বিছানা। বিছানা গোলাকার হয় তা অবশ্য আমি জানতাম না। নেক্কারজনকভাবে একের পর একেক মিথ্যা আরোপ করছেন তিনি।

২. ঐ কথাই। কার্পেট গোলাকার বস্তুর চারপাশেও বিছানো যেতে পারে।

> আসলে কার্পেট গোলাকার বস্তুর চারদিকে বিছানো যায় না। কার্পেট দিয়ে গোলাকার বস্তু মোড়ানো যায়। কুরআনের কি মারাত্মক শাব্দিক ভুল! অবশ্য সাহিত্য আর বিজ্ঞানকে মিশিয়ে ফেললে ঠিক আছে!

৩. অনেক স্থানে পৃথিবী বিস্তৃত করার কথা বলা হয়েছে। এর মানে পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

> বিস্তৃতিকে বানিয়েছেন সম্প্রসারণ। জাকির নায়েক বলছেন, সরাসরি সমতল তো আর বলা হয়নি। আমি জানি কেন বলা হয়নি। "পৃথিবী সমতল" এটা বৈজ্ঞানিক স্বীকার্যের মত। বিজ্ঞানীরা কোন কিছু প্রমাণ করলে সরাসরি বলে দেন। তারা যদি বের করতেন পৃথিবী সমতল তাহলে সরাসরি বলে দিতেন, পৃথিবী

সমতল। কুরআন কেন বিজ্ঞানের মত স্বীকার্য উল্লেখ করবে? তখন সবাই জানত, পৃথিবী সমতল। এটা বলার কোন প্রয়োজন পড়ে না। কুরআনে কেবল পৃথিবীর বিশালত্ব আর বিস্তৃতির বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্‌র মহিমা প্রকাশ করা হয়েছে। তাই বলি, "কুরআন বলেনি যে পৃথিবী সমতল, কিন্তু কুরআন একটি সমতল পৃথিবীর আকর্ষণীয় বর্ণনা দিয়েছে।"

৪. [৭৯: ৩০] আয়াতের মাধ্যমে নাকি সরাসরি বলে দেয়া হয়েছে, পৃথিবীকে আল্লাহ্ উটপাখির ডিমের মত করে তৈরী করেছেন। জাকির নায়েক এই আয়াতের অনুবাদ করেছেন:

"আমরা পৃথিবীকে উটপাখির ডিমের মত করে তৈরী করেছি"

## "দাহাহা" সমাচার

জাকির নায়েকের অনুবাদ তো আমরা দেখলাম। এবার অন্যান্যদের অনুবাদগুলো দেখি:

মা'আরিফুল কুরআন - পৃথিবীকে এর পর বিস্তৃত (দাহাহা) করেছেন।

ইউসুফ আলি - And the earth, moreover, hath He extended (to a wide expanse);

পিকথাল - And after that He spread the earth,

আর্বারি - and the earth-after that He spread it out,

শাকির - And the earth, He expanded it after that.

সারওয়ার - After this, He spread out the earth,

হিলালি/খান - And after that He spread the earth;

মালিক - After that He spread out the earth,[30]

মাওলানা আলি - And the earth, He cast it after that.

ফ্রি মাইন্ড্স And the land after that He spread out.

ফেইথ ফ্রিডমের ওয়াবসাইটে এ নিয়ে একটি সুন্দর পোস্ট আছে। সেটাই হুবহু অনুবাদ করে দিচ্ছি:[৫]

কুরআন বিস্তৃতি, কার্পেট, বিছানা এবং এ ধরণের অন্যান্য শব্দের মাধ্যমে সমতল পৃথিবীর ধারণা তুলে ধরেছে। বর্তমানে অনেক মুসলিম apologist এটা অস্বীকার করার চেষ্টা করেন। তারা [৭৯: ৩০] আয়াতের "দাহাহা" শব্দের ভিত্তিতে এই অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

অনেক ইসলামবাদী "দাহাহা" শব্দের অর্থ করার চেষ্টা করেছেন, উট পাখির ডিম বা উট পাখির ডিমের মত আকৃতির। তারা বলেন, এই আয়াতে দাহাহা দ্বারা বিস্তৃত করা বোঝানো হয়নি (অন্য সব স্থানে কিন্তু বিস্তৃত করাই বোঝানো হয়েছে)। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে, গোলাকার তথা উট পাখির ডিমের মত করে তৈরী করা।

অনেকে দাবী করবেন, দাহাহা শব্দের মূল হল দুহিয়া যার অর্থ উট পাখির ডিম। এখানে দাহাহা'র সাথে উট পাখির ডিমের সম্পর্ক করা যায় না। আরবি অভিধান ঘাটলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তারপরও অনেকে ডিম নিয়ে পরে থাকতে চান। তাদের জন্য আরেকটি হতাশার কথা হল, পৃথিবীটা আসলে উট পাখির ডিমের মত না। জ্যামিতিতে উপগোলক দুই ধরণের হতে পারে: prolate (মেরু বরাবর প্রসারিত) এবং oblate (বিষুব বরাবর প্রসারিত)। সকল ডিমই প্রোলেট আকৃতির। অবলেট হল কমলালেবু। পৃথিবীটা অবলেট আকৃতির। কবে না জানি দাহাহা'র অর্থ হয়ে যায় "কমলালেবু"!

আরেকজন দাহাহা দিয়ে প্রাচীন আরবের একটি খেলার দিকে নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেন,

> *এই আয়াতের মূল শব্দ দাহাহা। আরবিতে "ইজা দাহাহা" নামে একটি বাগ্‌ধারা আছে যার অর্থ, "যখন সে ভূমির গর্তের উপর পাথরটি নিক্ষেপ করে"। এখানে "উযিয়াতুন" অর্থ গর্ত এবং "আল-মাদাহি" দ্বারা বোঝায়, একটি গোলাকার পাথর আছে যার উপর নির্ভর করে মাটিতে গর্ত করা হয়, এরপর গর্তে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে একটি খেলা চলে। তার মানে দাহাহা শব্দের সাথে গোলের একটা সম্পর্ক আছে। অনেকে বলেন উটপাখির ডিমের আরবি শব্দ যেখান থেকে এসেছে দাহাহা শব্দটিও সেখান থেকে এসেছে। পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, পৃথিবী গোলাকার না বরং এলিপসয়েড। আর উটপাখির ডিমও এলিপসয়েড। আরবিতে "সমতল" শব্দটির প্রতিশব্দ হচ্ছে "সাবি" এবং "আল-মুস্তাবি"। কুরআনের কোথাও পৃথিবীর বর্ণনায় এ শব্দ দুটি নেই। আছে ফারাশ, মাহ্‌দ, বাসাত, দাহাহা, তাহাহা, সুতিহাত ইত্যাদি যেগুলো বিস্তৃত হওয়াকে নির্দেশ করে।*

এখানে তিনি দাহাহার সাথে উযিয়াতুন ও আল-মাদাহি শব্দ দুটির তুলনার মাধ্যমে যে গোলাকারের দিকে ইঙ্গিত করলেন তা সত্য না। কারণ, আল-মাদাহি ও উযিয়াতুন শব্দ দুটি কেবল দ্বিমাত্রিকের ক্ষেত্র প্রযোজ্য। আল-মাদাহি বলতে আরব রুটির মত বৃত্তকে বোঝায়, অর্থাৎ চাকতির মত। উযিয়াতুনও বৃত্ত বোঝায়, গোলক না। তাছাড়া, দাহাহা'র একটি অর্থ নিক্ষেপ করা। তাহলে, উপরের বাগ্‌ধারায় নিক্ষেপ করার আরবি হবে দাহাহা। পাথর বা গর্তের সাথে তার কোন সম্পর্কই নেই। আর মানে উযিয়াতুন ও আল-মাদাহি'র সাথেও তার কোন তুলনা নেই।

এর আরেকটি প্রমাণ আছে। অনেক মুসলিমই ফেইথ ফ্রিডম সাইটে লেইন লেক্সিকনের একটি পোস্ট থেকে উযিয়াতুন ও আল-মাদাহি'র কথা তুলে নিয়েছেন। কিন্তু তারা দ্বিমাত্রিকতার কথা সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন।

## আরজ আলী মাতুব্বরের "সত্যের সন্ধান"

"আমাদের বাঙালি কৃষক-দার্শনিক" আরজ আলী মাতুব্বর তার সত্যের সন্ধান বইয়ে কুরআনের অকেজো ধ্যান-ধারণা নিয়ে অনেক কিছু লিখেছেন। নামায আদায়ের সময় নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন। অভিজিৎ রায় সহ অনেকেই তাদের নিজ নিজ প্রবন্ধে এর উল্লেখ করেছেন। আমিও সংক্ষেপে উল্লেখ করছি:

কুরআন নামাযের জন্য সময় নির্দিষ্ট করেছে। নির্দিষ্ট সময় ছাড়া নামায আদায় করা যায় না। আবার কিছু সময়ে নামায আদায় নিষিদ্ধ। সূর্যাস্ত, সূর্যোদয়ের সময় নামায পড়া নিষেধ। এই নিয়মের কোন ধরণের ব্যতিক্রমের ইঙ্গিত কুরআনে নেই। কিন্তু সমস্যা হল, একই সময়ে পৃথিবীর এক স্থানে দুপুড় তো আরেক স্থানে মধ্য রাত হতে পারে। একই সময়ে হয়তো এক স্থানে সূর্য উঠছে এবং অন্য স্থানে এশার ওয়াক্ত চলছে। তার মানে একই সময়ে, এক স্থানে নামায পড়া সিদ্ধ কিন্তু অন্য স্থানে নিষিদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে ইসলামে নামাযের সময় নির্দিষ্টকরণের ধারণাটি সে সময়ে প্রচলিত ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আরজ আলী মাতুব্বরের ভাষায়:

> *এক সময় পৃথিবীকে স্থির আর সমতল মনে করা হত। তাই পৃথিবীর সকল দেশে বা সকল জায়গায় একই রকম সময় সূচিত হবে, বোধহয় এইরকম ধারণা থেকে ওই সমস্ত নিয়ম-কানুন প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু এখন প্রমাণিত হয়েছে, পৃথিবী গোল ও গতিশীল।*

তিনি আরও উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন, ধারা যাক, এক লোক বাংলাদেশে ঠিক দেড়টায় জোহরের নামাজ পড়ে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে প্লেনে উঠলেন। ঘণ্টায় ৩০০০ মাইল বেগে সৌদি আরব গিয়ে দেখবেন এখনও দুপুড়ই হয়নি। তাকে কি আবার নামাজ আদায় করতে হবে? পৃথিবীর এমন অনেক স্থান আছে যেখানে দীর্ঘকাল দিন বা দীর্ঘকাল রাত থাকে। এমন স্থানও আছে যেখানে রাত হতে না হতেই আবার সূর্য উদিত হয়ে যায়। এশার নামাজ পড়ার সময় পাওয়া যায় না। যেখানে দীর্ঘকাল দিন বা রাত সেখানে ঘড়ি যদি নামাজ পড়াও যায়, রোযা কিভাবে রাখা হবে। সেখানে রমযান মাসকেই পৃথক করার উপায় নেই। দিনের সেহরি বা ইফতারের সময়ও পৃথক করার উপায় নেই।

এসব যুক্তিকে অনেকেই হেলা করেন। মুসলমানরা বলে, ইজমা-কিয়াসের মাধ্যমে এগুলোর সমাধান করা যায়। এজন্যই তো ইজমা-কিয়াসের দ্বার খোলা রাখা হয়েছে। কিন্তু আমি বলি, ইজমা-কিয়াস এজন্য আসেনি। কুরআন-হাদিস থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ্‌ কস্মিনকালেও ধারণা করতে পারেননি যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সময় নিয়ে এতো ঝামেলার সৃষ্টি হতে পারে। স্থানভেদে ইসলামের আইন এভাবে পরিবর্তন করতে হবে এটাও ভাবতে পারেননি। পৃথিবীর সব স্থানে একই সময় ভেবেই নিয়মগুলো স্থির করা হয়েছে। কুরআনের সব কিছু নির্দেশ করছে, পৃথিবী সমতল।

এবারে কেবল মরিস বুকাইলির কথা বাকি থাকে। বুকাইলিই এই অলৌকিকতার বিজ্ঞানকে উস্কে দিয়েছিলেন। তার 'বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান' বইয়ের মতামত শমসের আলীদের মতই। অর্থাৎ তিনি মনে করেন, কুরআনে পৃথিবীকে সমতল বলা হয়েছে। কিন্তু, অপেক্ষাকৃত স্বল্প ক্ষেত্রের সাপেক্ষে।

একটা বিষয় নিয়ে অনেক কিছু লিখে ফেললাম। আমি আসলে সব কিছু পরিষ্কার করতে চাচ্ছিলাম। এজন্য পরিষ্কার বাংলায় "ছ্যাচরামি" পর্যন্ত করতে হয়েছে। এতোটা না করে আমি আমার বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে থাকলেও কাজের কয়েকটা জিনিস জানা হয়ে যেত। তারপরও এটাকে প্রয়োজন মনে করেছি। কারণ অন্য পক্ষ থেকে আমার কয়েক'শ গুণ "ছ্যাচরামি" করা হচ্ছে। কুরআনের আয়াতগুলোকে কানে ধরে বশ মানানো হচ্ছে। এমন সময়ে একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনে আমাদের তো এমন কিছু লেখাই উচিত। কারণ আমরা চাই এমন একটি জাতি যার শিক্ষাব্যবস্থা হবে বিজ্ঞানকেন্দ্রিক। ছোটবেলায় পরবর্তী প্রজন্মের কাউকে যেন, ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্ব পড়তে না হয় তা দেখা তো আমাদেরই দায়িত্ব। যতদিন বাবা-মা'রা ধর্মীয় অপজ্ঞানের কবল থেকে বেরিয়ে না আসবেন ততদিন ধর্মও টিকে থাকবে। বাবা-মা না পারি অন্তত শিক্ষাব্যবস্থা তো পরিবর্তন করতে পারি। এর একমাত্র উপায় হল, ধর্মীয় ধ্যান-ধারণাগুলোর অসারতা তুলে ধরা। আমি সেরকম কিছু অসারতা তুলে ধরলাম। কিছুটা হলেও দায়িত্ব পালন করলাম।

ধর্মে বিশ্বাস এখন পর্যন্ত খুবই স্বাভাবিক। বাংলাদেশের শিক্ষিত মহলেও যে তা কতটা প্রকট, ভাবাই যায় না। কয়েকদিন আগে ভার্সিটির এক বন্ধুর সাথে কথা হচ্ছিল। আমি বললাম, কুরআন বলেছে পৃথিবী সমতল। সে বলল, কুরআন যদি সত্যি এ কথা বলে থাকে, তাহলে পৃথিবী অবশ্যই সমতল। প্রথমে বিস্মিত হয়ে গেলাম। দ্বিতীয় দফায় তার বিশ্বাসের প্রশংসা করলাম, তৃতীয় দফায় তাকে যুক্তি দেখালাম। তার বিশ্বাসের প্রশংসা আমি বেশিক্ষণ করতে পারিনি, কারণ সে প্রকৃত বিশ্বাসী না। শুধু সে না, আমার সহপাঠিদের অধিকাংশই প্রকৃত বিশ্বাসী না। প্রকৃত বিশ্বাসী হলে তারা দোযখের আগুনকেও বিশ্বাস করতো। আর দোযখের আগুনকে বিশ্বাস করলে তারা জীবনে অনৈসলামিক কিছুই করতে পারত না। অথচ আমার সহপাঠিরা ২৪ ঘণ্টা সময়ের প্রায় পুরোটাই অনৈসলামিক কাজ করে কাটায়। কুরআন তো বলেছে, তোমাকে ২৪ ঘণ্টাই ইবাদাত করতে হবে। তুমি যে কাজটি করছ তা ইসলাম অনুযায়ী করতে হবে। অথচ তারাও জানেও না, ইসলাম অনুযায়ী করা কাকে বলে? তাদের চেয়ে আমি বেশি জানি এবং একসময় বেশি পালন করতাম। তাহলে তাদের এই অন্ধ বিশ্বাসকে আমি কি বলতে পারি। হ্যা, আমি এই অন্ধ বিশ্বাসকে বংশীয় ধর্ম টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা বলতে পারি, অন্ধ প্রচেষ্টা, যুক্তিহীন প্রচেষ্টা। সংস্কার ধরে রাখার জন্যই সবকিছু। এই বিশ্বাস এক দিক থেকে ক্ষতিকর। কারণ তারা ধর্মের কিছু জানে না, কিন্তু ধর্ম নিয়ে আবেগীয় কিছু ঘটতে দেখলে জীবন দিয়ে দিতে দ্বিধা করবে না। ভবিষ্যতে যে কি আছে জানি না।

এখন কেউ যদি পরিপূর্ণভাবে ইসলাম পালন করে এবং আমার ঐ বন্ধুটির মত অন্ধ বিশ্বাস পোষণ করে তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। আমি বলি, তুমি কুরআনে বিশ্বাস কর, যত ইচ্ছা কর। কুরআনে বিশ্বাস না করলে তো মুসলিমই হওয়া যাবে না। কিন্তু কুরআনের সাথে বিজ্ঞানকে মেলানোর চেষ্টা করো না। এই প্রচেষ্টা দেখেই আমার মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়েছে। পৃথিবীতে তো "ফ্ল্যাট আর্থ সোসাইটি" নামে একটা সমাজই আছে। অনেকে দাবী করেন, সৌদি গ্র্যান্ড মুফতি আবদুল্লাহ ইবন বাজ নাকি পৃথিবী সমতল বলে এক ফতোয়া জারি করেছিলেন। এই ঘটনার সত্যতা নিয়ে দ্বিধা আছে বিধায় আমি বিস্তারিত লিখিনি। তারপরও বলি, বিশ্বাস করলে করেন, কিন্তু ধর্মের সাথে বিজ্ঞানকে মেলানোর চেষ্টা করবেন না। আর আধুনিক শিক্ষা যেহেতু বিজ্ঞানভিত্তিক তাই বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট সবকিছু আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ধর্ম নিয়ে আলাদা থাকুন।

## তথ্যসূত্র

১. http://www.mukto-mona.com/Articles/avijit/Quran_miracle.htm

২. http://www.mukto-mona.com/Articles/mumin_salih/myth_scientific_quran.htm

৩. http://en.wikipedia.org/wiki/Flat_Earth

৪. জাকির নায়েকের লেকচার সিরিজ - ৫: কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান সামঞ্জস্যপূর্ণ নাকি অসামঞ্জস্যপূর্ণ

৫. http://www.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?t=23751

---

**খান মুহাম্মদ**, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির (আইইউটি) “তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল” বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। সচলায়তনে **শিক্ষানবিস** নামে লিখেন। ব্যক্তিগত ব্লগ - http://bigganpuri.wordpress.com/